আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ
বাংলাদেশ

IFI WATCH
BANGLADESH

বর্ষ ৩ সংখ্যা ৪
মে ২০০৭

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ

এশিয়া এনার্জি ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক

বিদেশী বিনিয়োগ

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বিদেশী বিনিয়োগের মাহাত্ম্য প্রচার করা হচ্ছে। সরকার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক), কথিত দাতাগোষ্ঠী ও সুশীল সমাজের কতিপয় প্রতিনিধি বিভিন্নভাবে এই প্রচারকাজে শরিক হয়েছেন। তাদের সবার মূল বক্তব্য হলো মোটামুটি এ রকম যে বাংলাদেশের জন্য বিদেশী বিনিয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর তাই বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব এলেই এক প্রকার বাছবিচার না করেই তা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে গত সরকারের সময় বিনিয়োগ বোর্ড ও এর তৎকালীন প্রধান নানাভাবে হইচই করে এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে বিদেশী বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান বাড়ছে, শিল্প খাতে প্রবৃদ্ধি ১০%-এর কোটা অতিক্রম করেছে ইত্যাদি। কিন্তু কত লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে? এই প্রশ্নের কোনো জবাব মেলেনি। এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০০৪ সালে মোট বিদেশী বিনিয়োগের ৩০% এসেছে উৎপাদনমুখী শিল্প খাতে, ২৮% টেলিযোগাযোগ খাতে, ২৭% তেল-গ্যাস-কয়লা ও জ্বালানিশক্তি খাতে; এবং ১৫% আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। মূলত স্থানীয় বাজার, রপ্তানিমুখী শিল্প খাত ও সেবা খাতভিত্তিক কর্মকাণ্ডে বৈদেশিক বিনিয়োগ বেশি হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ড বা সরকারের আরো দাবি ছিল, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নতি ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে দেশে শনৈঃশনৈঃ বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। আর এই উন্নতি ধরে রাখতে হলে টাটা ও এশিয়া এনার্জির মতো কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে দিতেই হবে। না দিলে সর্বনাশ হবে। কিন্তু সবারই একটা প্রশ্ন যে বিদেশি বিনিয়োগের ফলে লাভটা আসলে কী ও কতখানি? এর জবাব খুঁজতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু পরিসংখ্যানের আশ্রয় নিতে হবে। সেই পরিসংখ্যান অনুসারে ১৯৯৬ থেকে ২০০৬ সময়কালে বাংলাদেশে মোট বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ ছিল ৪৪৫.৭ কোটি ডলার। বেশ উৎসাহব্যঞ্জক চিত্র। তবে এটাও জানা দরকার যে একই সময়ে বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ থেকে মুনাফা, আয়, লভ্যাংশ ও ঋণ পরিশোধ বাবদ ফেরত পাঠিয়েছে ৩৬২.২ কোটি ডলার। এর মধ্যে শুধু ২০০১-২০০৫ সময়কালেই বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ২৭৪.৪ কোটি ডলার নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করেছে, যেখানে এই সময়কালে মোট বিদেশি বিনিয়োগের প্রবাহ ছিল ২১৮.৫ কোটি ডলার। এমন নয় যে বিনিয়োগকারীরা নিয়ম ভেঙে বা অবৈধভাবে এই অর্থ বিদেশে পাঠিয়েছে। সবই হয়েছে আইনের আওতায়। তবে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসন করার কারণে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেনের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়, তুলনামূলক অন্যান্য খাতের অর্থনীতিতে যে অবদান, পারিসংখ্যানিক বিচারে বিদেশি বিনিয়োগের অবদান অনেক কম। শুধু ২০০৫-০৬ অর্থবছরের একটি তুলনা করছি যে বছরে মোট রেমিট্যান্স আয় (প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো আয়) ছিল ৪৮০ কোটি ডলার। পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১ হাজার ২০ কোটি ডলার। আলোচ্য অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রাক্কলিত জিডিপির আয়তন ৪ হাজার ৭০ কোটি ডলার। এর মানে জিডিপিতে রপ্তানি আয়ের অবদান প্রায় ২৫% আর রেমিট্যান্স আয়ের অবদান প্রায় ১১%, সেখানে বিদেশি বিনিয়োগের অবদান ২%-এর কম। এসব পরিসংখ্যান সবার জানা দরকার এজন্য যে বিদেশি বিনিয়োগের গুণগত দিক সবার আগে বিবেচনা করতে হবে। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন কোনো বিদেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হওয়া ঠিক নয়, যেমনটি ঘটেছে এশিয়া এনার্জির ক্ষেত্রে।

শুরু থেকেই বিতর্ক

এশিয়া এনার্জির পূর্বসূরি হলো অস্ট্রেলীয় কোম্পানি বিএইচপি। বিএইচপি ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। ঐ সময় তৎকালীন বিএনপি সরকারের সঙ্গে তাদের একটি চুক্তি হয়। কিন্তু ১৯৯৮ সালে বিএইচপি তাদের স্বত্ব বিক্রি করে দেয় এশিয়া এনার্জির কাছে, যারা একটি ব্রিটিশ-অস্ট্রেলীয় কোম্পানি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, কোম্পানিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। তার মানে সম্পূর্ণ আনাড়ি ও অনভিজ্ঞ একটি কোম্পানি বাংলাদেশে কয়লা উত্তোলনের কাজ নেয়ার জন্য এগিয়ে আসে। ১৯৯৮ সালে জরিপের নামে ফুলবাড়ী কয়লাখনির স্বত্ব কিনে নেয়ার ব্যবস্থা করে। জরিপ প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা গেলে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী এলাকার প্রায় ৯০% কয়লা তুলে আনা সম্ভব হবে। এশিয়া এনার্জির কাছে মালিকানা হস্তান্তরের মধ্যে একাধিক অনিয়ম সংঘটিত হয়। ১৯৯৪ সালে যখন বিএইচপির সঙ্গে সরকারের চুক্তি হয়, তখন বলা হয়েছিল যে উত্তোলিত কয়লার ২০% বাংলাদেশ সরকার পাবে রয়্যালটি হিসেবে। হঠাৎ করে এটি কমিয়ে করা হলো ৬%। কিন্তু এ সংক্রান্ত বিধি পরিববর্তন করা হলো আরো ৪-৫ মাস পরে। আবার অনুমতি দেয়া হয়েছিল বিএইচপিকে। অথচ বিএইচপি সরকারকে কোনো রকম সরকারি ফি না দিয়েই তা এশিয়া এনার্জিকে হস্তান্তর করে। অথচ আইন অনুসারে এভাবে হস্তান্তরের কোনো অধিকারই নেই।

আবার আন্তর্জাতিকভাবে এশিয়া এনার্জি নাম পরিবর্তন করেছে। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি একটি বিশেষ কার্যবিবরণীর মাধ্যমে নাম পাল্টে রাখা হয় গ্লোবাল কোল ম্যানেজমেন্ট। তবে বাংলাদেশে এর নাম এশিয়া এনার্জি (বাংলাদেশ) লিমিটেড-ই, যা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে ফুলবাড়ী প্রকল্পটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কোম্পানি বাংলাদেশে ৩০ বছরে ১ কোটি ৫০ লাখ টন কয়লা উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন খনি প্রকল্প উন্নয়নের কাজে বিনিয়োগ করবে। এ ছাড়া উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ / The Innovators
বাড়ি - ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org ওয়েব: www.unnayan.org

২৬ আগস্টে রক্তাক্ত ফুলবাড়ী

২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি এবং ফুলবাড়ী রা কমিটির যৌথ উদ্যোগে শান্তিপূর্ণভাবে ফুলবাড়ীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করছিল। বিক্ষোভ দমন করতে একপর্যায়ে পুলিশ-বিডিআর গুলি চালালে সাতজন নিহত হয়। পুলিশ দাবি করেছে যে শনিবার পুলিশ কোনো গুলি চালায়নি। গুলি চালিয়েছে বিডিআর। আর বিডিআরের দাবি, বিডিআর একা নয়, পুলিশও গুলি চালিয়েছে। এ জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশও ছিল। তবে প্রশাসন বলছে, বিডিআর জোর করে ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে গুলির নির্দেশ আদায় করেছে। তবে আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এশিয়া এনার্জির সঙ্গে ফুলবাড়ী কয়লাখনি-সংক্রান্ত চুক্তি বাতিল ও এশিয়া এনার্জিকে প্রত্যাহার করাসহ আন্দোলনকারীদের ছয় দফা দাবি লিখিতভাবে মেনে নেয় সরকার। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের এক চুক্তিতে এশিয়া এনার্জিকে শুধু ফুলবাড়ী থেকে নয়, দেশ থেকেই প্রত্যাহার করা, এশিয়া এনার্জির সঙ্গে স্বাক্ষরিত সব চুক্তি বাতিল করা এবং বাংলাদেশের আর কোথাও উন্মুক্ত খননপদ্ধতিতে খনিজসম্পদ আহরণ না করার কথা বলা হয়। এ ছাড়া নিহতদের প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।

এশিয়া এনার্জির স্বার্থে কয়লানীতি

বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর পক্ষ নিয়ে কাজ করে থাকে কথিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা তথা বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও এডিবি। বাংলাদেশে এটি আবারও প্রমাণ হয়েছে টাটা ও এশিয়া এনার্জির বিনিয়োগ প্রস্তাবের পক্ষে বিভিন্নভাবে এসব সংস্থা থেকে তদবির করায়।

কারণ বিশ্বব্যাংক হচ্ছে টাটার একটি আর্থিক অংশীদার। আর এডিবি হলো এশিয়া এনার্জির। এখন এশিয়া এনার্জি যেন ফুলবাড়ীতে কয়লা উত্তোলন করার পর নিজের মতো করে তা রপ্তানি করতে পারে তা নিশ্চিত করতেই একটি কয়লানীতির খসড়া তৈরি করা হয়। আর খসড়াটি প্রস্তুত করে আইআইএফসি (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার)। আইআইএফসি হচ্ছে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, ডিএফআইডি (ব্রিটিশ) দ্বারা অর্থায়নকৃত সংস্থা। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে আইআইএফসি প্রণীত খসড়া কয়লানীতির প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৫-এ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে পেশ করা হয়। সেটি অনেকটা গোপনে সরকারি পর্যায়ে পর্যালোচনার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ সংশোধনীসহ প্রণয়ন করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সালে চতুর্থ সংশোধনী আসে। সেটি পর্যালোচনার প্রায় ৩ মাস পর পর ২৪ মে, ২০০৬ সালে সংশোধিত সর্বশেষ খসড়া কয়লানীতি সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। কিন্তু সাবেক সরকার তা অনুমোদন করেনি। বর্তমান সরকার এই খসড়া কয়লানীতি নিয়ে কী করতে যাচ্ছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে এটিকে অনুমোদন করানোর জোর চেষ্টা চলছে।

দেশে কয়লার মজুদ নিয়ে কয়লানীতিতে বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর ২০০৫ থেকে মে ২০০৬ পর্যন্ত দেশে মোট কয়লা মজুদের পরিমাণ ১৪০ কোটি টন থেকে শুরু করে ২৭০ কোটি টন ধরা হয়েছে। কীভাবে ১৪০ কোটি টনের মজুদ মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে দ্বিগুণ হয়ে গেল?–দেশীয় বিশেষজ্ঞরা এই প্রশ্নটি তুলে ধরে বলেছেন যে এখানে কয়লার মজুদ বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে এশিয়া এনার্জির কয়লা রপ্তানির পথ সুগম করতে। বাংলাদেশে বড়পুকুরিয়া থেকে প্রতিবছর ১০ লাখ টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে মাত্র ৫ লাখ টন। অথচ খসড়া কয়লানীতিতে প্রতিবছর ২ কোটি টন উত্তোলন করার এবং ২০ বছরের মধ্যে এটা ৪ কোটি টনে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, সাধারণভাবে যদি আপনি দেখতে চান তাহলে ২০ মিলিয়ন টন প্রতিবছর উত্তোলন করতে হলে আপনাকে অবশ্যই উন্মুক্ত খননপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। তারা আরো বলেছেন যে উন্মুক্ত খননপদ্ধতিতে একটি খনি থেকে কয়লা তোলা যাবে না, দুটি খনি লাগবে। ফলে পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

পাওয়ার সিস্টেম মাস্টারপ্ল্যানের ভিত্তিতে ১৯৯৫ সালে ২০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায় বিদ্যুতের চাহিদা ধরা হয়েছিল ২০০৫ সালে ৪,৬০০ মেগাওয়াট, ২০১০ সালে ৬,৪০০ মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৯,৯০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের চাহিদা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে ২০১০ সালের মধ্যেই কমপক্ষে অতিরিক্ত ৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রিডে সরবরাহ করতেই হবে। আর এই বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোনো অবস্থাতেই কয়লার বিকল্প নেই। এ জন্য প্রতিবছর ১ কোটি ৪০ লাখ টন কয়লার দরকার হবে। ২০১৫ সাল নাগাদ আরও অতিরিক্ত ৫,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উপাদন করতে হবে, সে জন্য অতিরিক্ত আরও ১৪০ কোটি টন কয়লা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, এ চাহিদা মেটাতে সুড়ঙ্গপদ্ধতিতে উত্তোলনযোগ্য কয়লার মজুদ ২০২০-২০২৫ সালের মধ্যেই শেষ হবে–এমন ধারণা করছেন বিশেষজ্ঞরা। অবশ্য বড়পুকুরিয়া ও ফুলবাড়ী কয়লাখনি যদি যথাক্রমে টাটা ও এশিয়া এনার্জি কোম্পানিকে দেয়া হয় এবং তা থেকে উত্তোলনকৃত কয়লা রপ্তানি করা হয়, তাহলে এ মজুদ বহু আগেই শেষ হবে। আর এশিয়া এনার্জি যে রপ্তানি করবেই, তা স্পষ্ট হয় খসড়া কয়লানীতিতে কয়লা রপ্তানির যে বিধান রাখা হয়েছে তা থেকে। এ বিধান অনুযায়ী এশিয়া এনার্জি কোম্পানি ৮০% কয়লাই বিদেশে রপ্তানি করবে।

এডিবির আচরণ

এডিবি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে, বিশ্বব্যাংকও করছে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট মোচনের জন্য এডিবি ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির পরামর্শ দিয়েছে। এর পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে এই বলে যে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি শুধু আমদানি নয় বরং এটি আন্তঃআঞ্চলিক বিদ্যুৎ সংযোগের একটি পদক্ষেপ। গোটা দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার করার জন্য এডিবি বারবার জোর দিয়ে আসছে বলেও এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হুয়া দু বিভিন্ন সময় মন্তব্য করেছেন। অথচ দেশের ভেতরে কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কোনো ধরনের কারিগরি সহায়তা দিতে তারা রাজি নয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭) ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেছেন যে বর্তমানে দেশে যে বড় ধরনের বিদ্যুৎ ঘাটতি রয়েছে তা রাতারাতি হ্রাস করা সম্ভব নয়। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ও সাশ্রয়ী ব্যবহারের ওপর জোর দিয়ে এডিবি বলেছে যে সারা দেশে যদি বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় তাহলে অন্তত ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। আর টাটা ও এশিয়া এনার্জির পক্ষে একাধিকবার প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছে এডিবি। চলতি বছরের মার্চ মাসেই (২৭ মার্চ, ২০০৭) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক প্রকাশনা উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে হুয়া দু টাটাসহ বড় বিনিয়োগ প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'টাটা সম্প্রতি কয়লা ও ইস্পাতের জন্য ভিয়েতনামের সঙ্গে চুক্তি করেছে। বাংলাদেশকে দেওয়া প্রস্তাবের ব্যাপারে দ্রুত সাড়া না পেলে তারা অন্য কোনো স্থানে বিনিয়োগ করবে।' স্পষ্টতই এডিবির এই বক্তব্য এশিয়া এনার্জির বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার জন্য সরকারের ওপর এক ধরনের চাপ।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে গত ২০০১-০৬ সময়কালে এডিবি বাংলাদেশকে প্রদেয় প্রায় ২৫ কোটি ডলারের সহায়তা বাতিল করেছে। বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ প্রায় ১ হাজার ৬৭৫ কোটি। এসব প্রকল্পের মধ্যে আছে সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য প্রকল্প (৩ কোটি ৭০ লাখ ডলার), নগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প (৬৮ লাখ ৯০ হাজার ডলার), ঢাকা বিদ্যুৎব্যবস্থা উন্নতকরণ প্রকল্প (৭০ লাখ ডলার), পশ্চিমাঞ্চলে বিদুৎব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প (২ কোটি ১২ লাখ ১০ হাজার ডলার) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ কোটি ডলার)।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে সহায়ক এমন প্রকল্পই বেশি বাতিল হচ্ছে। এর দুটো দিক আছে। প্রথমত, প্রকল্পগুলো এমনভাবে নকশা করা হয়, যার থেকে সুফল পাওয়ার সুযোগ কম। দ্বিতীয়ত, অনিয়মের যে কথা বলা হয়, তার অনেকখানির জন্য এডিবি নিজেও দায়ী। কিন্তু সেই দায় এড়াতে প্রকল্প বাতিলের পথ বেছে নেওয়া হয়। ১৯৭৩ সাল থেকে এডিবি বাংলাদেশকে সহায়তা দিয়ে আসছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এডিবি বাংলাদেশকে ৮২০ কোটি ডলার সহায়তা দিয়েছে ঋণ ও অনুদান মিলিয়ে।

প্রতারণার কিছু খণ্ডচিত্র

বিতর্কিত কোনো কাজ করাতে চাইলে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ যেসব কৌশলের আশ্রয় নেয়, তার অন্যতম হল সংশ্লিষ্ট কাজের দ্বারা নানাভাবে সুবিধা পেতে পারে ও সমস্যায় পড়তে পারে এমন সব ধরনের মানুষের সঙ্গে আলোচনা বা পরামর্শ করা। এটিকে তারা বলে থাকে অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ (পার্টিসিপেটরি কনসালটেশন)। বাংলাদেশে যে দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন করা হয়েছে, সেখানেও এ ধরনের আলোচনা ও পরামর্শ হয়েছে বলে দাবি করা হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকও এই প্রবণতার বাইরে নয়। সে কারণে তাদের সহযোগিতায় ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সবসাসকারী মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেই প্রকল্পটির কাজ এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দাবি করেছে এশিয়া এনার্জি। ফুলবাড়ী প্রকল্পের ওপর একটি ঢাউস পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় এডিবির সহযোগিতায়। এডিবি যেহেতু এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অর্থায়নকারী সংস্থা হতে আগ্রহ ব্যক্ত করে, সেহেতু এই মূল্যায়নকাজে তাদের সক্রিয়তা ছিল লক্ষ্যণীয়। 'ইউআরএস' নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাব নিয়ে কাজ করে, তাদেরকে এই কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। কিন্তু এক বছর ধরে কাজ করে যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে যৌক্তিক কারণেই।

সংবিধান ও কয়লানীতি

সংবিধানের ১৪৩(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের ওপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত সম্পত্তিসমূহ প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে:

(ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী;

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশে মহীসোপানের উপরিস্থিত মহাসাগরের অন্তঃস্থ ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী।"

আবার সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবলই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"

৭(২) অনুচ্ছেদ: "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানিই বাতিল হইবে।" কোনো সন্দেহ নেই কয়লা বাংলাদেশের একটি মূল্যবান খনিজসম্পদ। আর তাই কয়লাবিষয়ক যেকোনো নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক মতামত জানতে ও সে অনুসারে ব্যবস্থা নিতে সাংবিধানিকভাবে যেকোনো সরকার বাধ্য।

প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ওই এলাকায় ও আশপাশে বসবাবসকারী প্রায় ৩৪ হাজার পরিবারের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে পুনর্বাসন করতে হবে এমন ১২ হাজার ৭৮০টি পরিবার এবং ১ হাজার ৫২৪টি বাণিজ্যিক সংস্থার ওপর জরিপ চালিয়ে তাদের পুনর্বাসন ও তিপূরণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত নেয়া হয়। এতে বলা হয় যে ফুলবাড়ীতে ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে এশিয়া এনার্জির যে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়, সেখানে প্রতিদিন গড়ে ২০ জন করে এলাকাবাসী এসেছে তাদের মতামত জানাতে এবং প্রায় ৮০% লোক এই প্রকল্পের পক্ষে সম্মতি দিয়েছে। ওই তথ্যকেন্দ্রে এসে এরা নাকি তাদের মতামতের পক্ষে স্বাক্ষরও করেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক নস্ট্রোম রিসার্চ নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এর পরিচালক রজার মুডি এই তথ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলেন এবং দর্শনার্থীদের জন্য রাখা পরিদর্শন বইটিও দেখেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে ওখানে যাদের নাম ও স্বাক্ষর পাওয়া গেছে, তাদের অনেকেই আদৌ ফুলবাড়ীতে বসবাস করে না অথবা তাদের সঠিক কোনো পরিচয় পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের লাভ: শুভঙ্করের ফাঁকি!

ফুলবাড়ী প্রকল্প থেকে বাংলাদেশ কী পরিমাণ লাভবান হবে তার একটি অতিরঞ্জিত ও বিভ্রান্তিকর চিত্র তুলে ধরেছে এশিয়া এনার্জি। বলা হয়েছে যে প্রকল্পের কাজ শুরুর পর থেকে ৩০ বছরে ২ হাজার ১০০ কোটি ডলারের (২১ বিলিয়ন) সমপরিমাণ সুবিধা পাবে। এর মধ্যে এশিয়া এনার্জির কাছ থেকে ৬% রয়্যালটি ও অন্যান্য ফি বাবদ বাংলাদেশ পাবে ৭০০ কোটি (৭ বিলিয়ন) ডলার। এই প্রকল্পের ফলে সরাসরি এক হাজার লোকের কর্মসংস্থান এবং অস্থায়ীভিত্তিতে আরো ২,২০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে। কোম্পানি দাবি করেছে, প্রতিটি প্রতক্ষ্য কর্মসংস্থান আরো ১০টি পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। এর মানে ২০ হাজার লোকের কাজের সুযোগ তৈরি করবে এশিয়া এনার্জি। তবে এসব তথ্য কোনো যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের ওপর দাঁড়িয়ে করা হয়নি। আবার বলা হয়েছে, প্রকল্প চলাকালীন বাংলাদেশের জিডিপিতে সরাসরি ৭৮০ কোটি ডলার যুক্ত হবে। আর পরোভাবে যুক্ত হবে আরো ১,৩৭০ কোটি ডলার। এই হিসাবটি আবার করেছে জিএইডি নামে একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানি। বলা হচ্ছে, ৬% রয়্যালটি ছাড়াও কর্পোরেট ট্যাক্স হিসেবে ৪৫% এবং আমদানি শুল্ক হিসেবে ২.৫% পাবে বাংলাদেশ। কিন্তু পুরো হিসাবই অনেক গোঁজামিল দিয়ে দেখানো হয়েছে।

এখানে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এখন বছরে প্রায় ৫০০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পায়। প্রবাসী বাংলাদেশিরাই এটি পাঠাচ্ছেন। বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ২৫%। এই হার যদি ২০%-ও হয়, তাহলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে রেমিট্যান্সের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। এশিয়া এনার্জির দেয়া হিসাব যদি সত্যি বলে ধরেও নেয়া হয়, তাহলেও দেখা যায় যে বাংলাদেশ এই বিদেশি বিনিয়োগের ফলে যে প্রতক্ষ্য আর্থিক লাভ পাচ্ছে তা অত্যন্ত নগণ্য।

প্রতিবেদনে পরিবেশগত ক্ষতির বিষয়টি উপেক্ষিত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে কৃষিজাত জমির সামান্য ক্ষতি ছাড়া খনি এলাকায় বসবাসরত জন সাধারণের ওপর খনির প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে সামান্য। এশিয়া এনার্জির এসব তথ্য সময়ে সময়ে পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন অক্টোবর ২০০৫-এ প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়েছে, খনির নকশা পুনঃনির্ধারিত হয়েছে এবং বদলানো হয়েছে। তাতে ৫০ হাজারের স্থলে ৪০ হাজার লোক সরাতে হবে, জমি দরকার হবে ৬,৫০০ হেক্টরের স্থলে ৫,৯০০ হেক্টর এবং ফুলবাড়ী শহরের অধিকাংশ পূর্বাংশ এখন খনির মধ্যে পড়বে না। এটাকে বিশেষজ্ঞরা মেনে নিতে নারাজ। তারা বলছেন যে সব মিলিয়ে ওই এলাকায় বসবাসকারী অন্তত দেড় লাখ লোক সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে আবাদযোগ্য জমির গুরুত্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকলেও এই কয়লাখনির জন্য প্রায় ১৩ হাজার একর আবাদযোগ্য জমি ছেড়ে দিতে হবে। এই জমির ওপর চাষাবাদ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদের জীবিকা ধ্বংস হবে।

তা ছাড়া উচ্ছেদের কারণে ওখানকার বসতবাড়ি, জমি, পরিবেশ, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল এমনকি ওখানকার পুরাকীর্তিও উচ্ছেদ হবে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবে। আবার উন্মুক্ত কয়লা খনন পদ্ধতিতে পানির স্তর

ক্ষতিসাধিত হবে। কারণ এ পদ্ধতির জন্য প্রায় ৩০ থেকে ৪০ তলার সমান গভীরতায় খনন করা হবে। খননকাজের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হবে। এতে ব্যাপক এলাকাজুড়ে মরুকরণ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটার বিস্তার প্রকল্প এলাকার ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এর পরের এলাকার পানির স্তরও অনেক গভীরে নেমে যাবে। কয়লা শোধন ক্রিয়ার কারণে পানি বিষাক্ত হয়ে পড়বে। পানি ১০০ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত বিষাক্ত হয়ে পড়েত পারে। সব মিলিয়ে ৩০ বছর পর ওই এলাকা কোনোভাবেই বাসযোগ্য থাকবে না। আর মডেল টাউনের মাধ্যমে লোকজনকে পুনর্বাসন করার যে পরিকল্পনা এশিয়া এনার্জি করেছে তাও বাস্তবসম্মত নয়।

অস্বচ্ছ ও বেআইনি চুক্তি

ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে এশিয়া এনার্জি কর্পোরেশনের সঙ্গে সরকারের চুক্তিটি একাধারে অবৈধ, অসম ও জাতীয় স্বার্থবিরোধী। চুক্তিটি যে অবৈধ তা গত সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান নিজেই একবার বলেছিলেন। তিনি জোর গলায় এও বলেছিলেন যে এ চুক্তি যারা করেছে তারা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করেছে। আর তাই তাদের শাস্তি- হওয়া উচিত। স্পষ্টতই তিনি এ সময় ১৯৯৬-২০০১ সময়কালে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের প্রতি এই অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে দায়মুক্ত রাখার কৌশল নেন। সরকারি ভাষ্য হিসেবে তিনি এ কথাও বলেন যে যেহেতু চুক্তিটি হয়ে গেছে, সেহেতু এটা আর বাতিল করা যাবে না। ফুলবাড়ী আন্দোলনের পর যখন চুক্তি বাতিলের বিষয়টি সামনে এল, তখন বিদেশি বিনিয়োগের পুরানো ধুয়ো তুলে বলা হয় যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ রকম কোনো চুক্তি বাতিলের নজির নেই। ফলে এটা করা হলে তা দেশের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর হবে। চুক্তি অবৈধ হলে তা কেন বাতিল করা যাবে না সেটি এক রহস্যময় প্রশ্ন। কেউ কেউ বলেছেন যে বাতিল করলে এশিয়া এনার্জিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে। কারণ তারা আন্তর্জাতিক আদালতে যাবে এবং সেখানে সরকার হেরে গেলে ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে। কিন্তু সেদিকে না যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে এবং চুক্তি বাতিল না করেও ফুলবাড়ী খনি উত্তোলন থেকে বিরত থাকা সম্ভব। কারণ এশিয়া এনার্জিকে মূলত অনুসন্ধান (এক্সপ্লোরেশন) লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল। তারা সম্ভাব্যতা যাচাই করে খনিটি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উন্নয়ন করার একটি পরিকল্পনা সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। পরিবেশ ও সামাজিক কারণে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনি উন্নয়ন পরিকল্পনাটি সরকার গ্রহণ নাও করতে পারে। এটি বর্জন করার এখতিয়ার রয়েছে সরকারের। এর ফলে চুক্তি বাতিল করা ছাড়াই সরকার এ সমস্যাটা এড়িয়ে যেতে পারে। এশিয়া এনার্জির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে ইতিমধ্যে তারা দুই কোটি ডলারের বেশি ব্যয় করে ফেলেছে। তাদের এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো উত্তোলনের কাজ করতে না দিলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা। কিন্তু এক্সপ্লোরেশন লাইসেন্সে এরকম কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা নেই। তা ছাড়া চুক্তির আওতায় এশিয়া এনার্জিকে ফুলবাড়ীসহ আশপাশ এলাকায় কয়লা অনুসন্ধান ও সম্ভাব্যতা যাচাই করার অনুমোদন দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এশিয়ার অন্যান্য দেশেও চুক্তির মডেলগুলো প্রায় একই ধরনের। একটি চুক্তির আওতায় কোম্পানি প্রথমে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য অনুসন্ধান কাজের অনুমোদন পায়। এরপর সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন ও খনি উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সরকারের কাছে জমা দেয়। সরকার এরপর মাইনিং লিজ দেওয়ার জন্য চূড়ান্ত চুক্তিটি করে অথবা তা নাও করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার এশিয়া এনার্জির সঙ্গে মাইনিং লিজটি এখনো করেনি বা চূড়ান্ত চুক্তিটি করেনি। যা করা হয়েছে তা হলো অনুসন্ধান লাইসেন্স।

সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জ্বালানি উপদেষ্টা তপন চৌধুরী বলেছেন (১৯ এপ্রিল, ২০০৭) যে ফুলবাড়ী কয়লাখনি উন্নয়নে এশিয়া এনার্জির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে দেশের স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি। ওই চুক্তিতে জরিমানা করার মতো কোনো অনুচ্ছেদ ছিল না। এখন থেকে এসব খাতে যেকোনো চুক্তি করার সময় জাতীয় স্বার্থের বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে এই চুক্তি বাতিল করা হবে কি না সে সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। বরং বলেছেন যে একটি রাষ্ট্রীয় চুক্তি বাতিল করার আগে আইনগত দিক অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে।

তিনি আরো বলেন যে কয়লানীতি চূড়ান্ত হওয়ার আগে এশিয়া এনার্জির বিষয় নিয়ে সরকার কোনো চিন্তা ভাবনাই করছে না। কয়লানীতি কবে চূড়ান্ত হবে সে বিষয়েও স্পষ্ট কিছু না বলে তিনি জানান যে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং তাদের সুপারিশ নিয়ে কয়লানীতি চূড়ান্ত করা হবে।

উল্লেখ্য, ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভে সাতজন নিহত হন। বিক্ষোভ থামাতে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান একটি চুক্তি সই করেন। চুক্তিতে প্রথম দফাই ছিল, এশিয়া এনার্জির চুক্তি বাতিল করতে হবে। কিন্তু জোট সরকার চুক্তিটি বাতিল করেনি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। জ্বালানি বিভাগ তখন এশিয়া এনার্জির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা যাবে কি না তা জানার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে চিঠি দেয়। আইন মন্ত্রণালয় আজও এর কোনো জবাব দেয়নি।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যণ / IFI Watch, উন্নয়ন অন্বেষণ - দি ইনোভেটরস্ কর্তৃক প্রস্তুকৃত। মূল তত্ত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর এবং বাংলায় রচিত তামিম আসজাদ। উন্নয়ন অন্বেষণের পক্ষে এটি প্রকাশ করেছেন নজরুল ইসলাম, সদস্য-সচিব। সংখ্যার অলংকরণ: আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যণের ইংরেজি সংস্করণসহ অন্যান্য প্রতিবেদন পাওয়া যাবে: www.unnayan.org। বেশির ভাগ প্রতিবেদনই ডাউনলোডযোগ্য।

চলতি সংখ্যাটি নিজেরা করি ও উন্নয়ন অন্বেষণের যৌথ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশিত।

নিজেরা করি
Nijera kori

The Nijera Kori is a continuous and diverse movement focusing on social mobilisation and ensuring accountable democratic structures, targeting the most marginalised groups through the development of autonomous landless organisations with an emphasis on gender equity.

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

The Unnayan Onneshan-The Innovators, an independent not-for-profit registered trust, aims to contribute to innovation in development through research, advocacy, solidarity and action. The alternative public policy watchdog was established in 2003 by a group of university faculties and development professionals across Bangladesh to contribute to the search for solutions to endemic poverty, injustice, gender inequality and environmental degradation at the local, national and global levels. The philosophy and models of the centre for research and action focus on pluralistic, participatory and sustainable development and seek to challenge the narrow theoretical and policy approaches derived from unitary models of development.